পূরবী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূরবী

কবিতাগুলি লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে। ১৩২৪ হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে লেখা কবিতাগুলি "পূরবী" অংশে এবং ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা কবিতা "পথিক" অংশে দেওয়া হইল। অনেক পুরানো কবিতা এতদিন কোনো বইতে গ্রথিত হয় নাই, সেগুলি "সঞ্চিতা" অংশে ছাপানো হইয়াছে।

প্রত্যেকটি কবিতার নীচে লেখার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে তারিখ ঠিক জানা নাই অথচ মোটামুটি ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় সেখানে একটি *-চিহ্ন দেওয়া হইল। যেখানে লেখার তারিখ জানিবার কোনো উপায় নাই সেখানে "প্র"-চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

শব্দের প্রথমের একারের "্যা"-উচ্চারণ দেখাইবার জন্য রবীন্দ্র নাথের নির্দ্দেশ অনুসারে "ে"-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা—'দেখো' (দেখিও) আর 'দেখো' (দ্যাখো=দেখহ); 'ফেলো' (ফেলিও) আর 'ফেলো' (ফ্যালো=ফেলহ) প্রভৃতি।

অ-কারের ও-ধ্বনি '-চিহ্ন (ইলেক চিহ্ন) দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—"করে" আর "ক'রে" (কোরে—করিয়া অর্থে); "দলে" (দলন করে) আর "দ'লে" (দলন করিয়া)।

উপরোক্ত চিহ্নগুলি যথাসম্ভব ব্যবহারের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু ছাপার ত্রুটিতে বইখানির সকল স্থানে ঠিক মত ব্যবহৃত হয় নাই।

শ্রাবণ, ১৩৩২ প্র——

মূল্য—২৲; বাঁধাই—২॥০; মোটা এণ্টিক কাগজে—২৸০ ও ৩।০

ইণ্ডিয়ান... ইউ, রায় এণ্ড সন্স প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ

◇

বিজয়ার করকমলে —

◇

সূচি

পূরবী

পথিক

সঞ্চিতা

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিলো তুলি';
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়ু।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পূরে ;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হ'তে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম

শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইলো পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে দিনের আলো,—
ব'লে নে ভাই, "এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

(প্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।)

বিজয়ী

তখন তা'রা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুট্‌ছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত ধূলির পথ বিপথে।
তখন তাদের চতুর্দ্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দ-গমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে ;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষ-ছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠলো জ্ব'লে,—
অন্ধকারের ঊর্দ্ধতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটলো প্রবল দম্ভভরে ;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।
ভাবলো পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ড-পলের মরীচিকা।

ভাবলো তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বল্‌বে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবলো তা'রা, এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ ক'রে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে কর্‌বে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চম্‌কে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপ্‌নাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন-আগে
জ্বল্‌ছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

(প্র—চৈত্র, ১৩২৪।)

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠতো ক্ষেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কল-কথায়,
সেদিন মনে হ'তো কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়-কুঞ্জ-ছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।

আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-ক্ষেতে
সূর্য্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠতো দুলে
কচি ধানের খাম-খেয়ালি খেলায়
সেদিন আমার হ'তো মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তা'রি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি !

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্তঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,

তাহার বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেছে হরণ ক'রে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ স্থরে—
"গেছিস দূরে, অনেক দূরে,"
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো ক'রে পাইনি তাহা বুঝে ;
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তা'র
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তা'র নিত্য আরাধন।
এইখানে তা'র অঙ্ক-মাঝে
প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হ'তে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁট-কাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্ব্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জ্জনা জমে উপার্জ্জনে।

যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে ;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চ'লে যাই মুক্তি-সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তা'র সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইলো ব্যবধান।

যে দূতগুলি গগন-পারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হ'য়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে-ঘর আছে
তা'র দিকে আজ ফিরলো উদাসীন ॥

(২৩ ফাল্গুন, ১৩২৮)

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হ'লো ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে ক'রে আনি',
দ্বারে আসি দিল' ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্ম্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে ল'য়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তা'রি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এই দিন এলো আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।

জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছসি যেন রে
শূন্য দিল' ভ'রে।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।

সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তা'রে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ; —
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হ'তে দীপ্ত হুতাশন।

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি' উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি',
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি' আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত-মাঝে
চির-নূতনেরে দিল' ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

(২৫ বৈশাখ, ১৩২৯)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী।   হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত' তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-পরে ?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
প্রতি বর্ষে দিত' সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা ; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'

এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে।   তাই তা'রে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি'; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

২

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিলো প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তা'রা যা হারালো তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছো আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আসো নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিলো অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;

আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তা'র সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তা'রি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তা'র সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিলো আনি'
ঝ'রে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাবো ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া-পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে ;
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি ল'য়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।

আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হ'তে গেল খসি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দ-হীন সঙ্গীত-ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাবো তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিলো তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

(আষাঢ়, ১৩২৯)

শিলংয়ের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী—

কল্যাণীয়াসু।

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাব্‌ছি ব'সে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিলো আমার পদ্য লেখার বদ্‌-অভ্যাস,
মনে ছিলো হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হোক 'লঙ্‌ফেলো'দের হবো আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে হ'য়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাক্‌তে প'ড়ে সদা চিৎ।
যা-হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম প'ড়েছে তাই হ'য়েছে বৈরি সে;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফির্‌ছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালী লে আও ধাঁ কর্‌কে।"

ভাব্‌ছি যদি তোমরা তু'জন বছর তিরিশ পূর্ব্বেতে
গরজ ক'রে আস্‌তে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজ্‌কে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্ত্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিলো সব হাবা লোক,
তখন যদি ব'ল্‌তে আমায় লিখ্‌তে পয়ার মিল ক'রে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরতো পিল্‌-পিল্‌ ক'রে।
পঞ্জিকাটা মানো না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই ?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছো অক্ষণেই।
যা হোক তবু যা পারি তাই জুড়্‌বো কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।
শিলংগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে ;—
মিল বাঁচাবো, মেনে যাবো মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তা'র বেশী আর ক'র্‌লে আশা ঠক্‌বে এবার নিতান্ত।

* * *

গর্ম্মি যখন ছুট্‌লো না আর পাখার হাওয়ায় সর্‌বতে,
ঠাণ্ডা হ'তে দৌড়ে এলুম শিলঙ্‌ নামক পর্ব্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।"
ঝর্‌ণা ঝরে কল্‌কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সঙ্গীতে।

বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন্ বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তা'র বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তা'র ফাঁক দিয়ে।
দার্জ্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হ'লেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তা'র বৃষ্টিপাত ;
মোদের পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগ্‌লো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন্-পাতার গন্ধ বয় ;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখী নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুর বেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন, গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলো-ছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-ক্ষেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দীতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল সোনালীর সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচ্-কাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্রপাইপ নামক বাদ্য-ভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সর্‌গরম,
গুলিগোলার ধড়্‌ধড়ানি, বুকের মধ্যে থর্‌থরম্।

আর ভালো নয় মোটর-গাড়ির ঘোর বেস্থরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্ব্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা'ছাড়া সব পিস্থ মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি ;
এমনতরো ছোটখাটো একটা কিম্বা অর্দ্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দ্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে ;
মোটের উপর শিলঙ্ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তা'র সাজ বাকি।

* * * *

ছড়া কিম্বা কাব্য কভু লিখ্‌বে পরের ফর্‌মাসে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্ম্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ র'চে ক'রেছি কাল নষ্ট তো ;
এইখানেতে কারণটি তা'র ব'লে রাখি স্পষ্টত,—
তোমরা দু'জন বয়সেতে ছোট-ই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি'।

তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা-দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় করোনি দুর্ব্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয়নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখ্‌তে চিঠি হুকুম এলো লম্ফিত,
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হ'লো উৎসাহে,
মনে হ'লো, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হ'লো আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা,
জরার কোপে দাড়ি-গোঁপে হয়নি জবড়-জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তা'রা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক-বয়সী ব'লে আমায় চিনেছে এক নিশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হ'তে মন এম্‌নিতরো খুশ্ আছে,
ডাক্‌ছে ভোলা "খাবার এলো" আমার কি আর হুঁশ আছে?
জান্‌লা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখ্‌তে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোট্ট দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

(শিলং, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝ'রে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তা'রা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, "চলো চলো !"
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্দ্ধপানে চায়, দেখে অরুণ-আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংস-শুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তা'র চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি

তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি' খুঁজি'
গেছে সাত ভাই চম্পা ; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ ; দিগ্বধূর বেণুতে বেণুতে
বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি'
উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-হাওয়া

ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল-পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তা'র হ'য়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তা'রা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে,—বলে, বৃন্ত-বন্ধহারা
যাবো উদ্দামের পথে, যাবো আনন্দিত সর্ব্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাবো, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্ম্মম উল্লাস-বেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।"

ওরা ডেকে বলে, "কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যা-মেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা-সভায়,
যেথা তা'র সর্ব্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণু-পরে
সঙ্গীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে ?"

বলে, "যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
নে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঙ্গণে
্তে নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগুলি,
মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
হ'য়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি' মর্ত্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি'।
আমি তব সাথী,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির-সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সঙ্গীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্ব্বাকের নির্ব্বাণ বাণীর হোমানলে।"

(৫ই আশ্বিন, ১৩৩০)

তপোভঙ্গ

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছো কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেলো কি সব ভাসি' ?
আশ্বিনের বৃষ্টি-হারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেলো বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্ম্মম হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছো কি পাসরি' ?
দস্যু তা'রা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিলো শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিলো মঞ্জিরা, বাঁশরী।
গন্ধ-ভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য্য-রভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেলো ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান - মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি' দিলো অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যা-স্রোতে সন্ন্যাসের হ'লো অবসান ;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য্য তব
উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'লো আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ম্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পান-পাত্র, আজ তা'র ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে?
অগীত সঙ্গীত-ধার,
অশ্রুর সঞ্চয়-ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে?

তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হ'য়েছে সে ধূলি?
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি?

নহে নহে, আছে তা'রা ; নিয়েছো তা'দের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্ত-ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছো বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে! নাহি রে!"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জ্জন প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নিত্যস্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খল-হীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তা'রি সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়-মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী ;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি'।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্য-মনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যান-চ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।

ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি',
প্রাতঃসূর্য্য-রুচি।
অস্থি-মালা গেছে খুলে
মাধবী-বল্লরী মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।

(* কার্তিক, ১৩৩০)

ভাঙা মন্দির

(১)

পুণ্য-লোভীর নাই হ'লো ভীড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।

অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে,
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।

সম্মুখ পানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বন-ফুলদল ঐ এলো ধেয়ে
উল্লাসে চারিধারে।

দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনা গান,
কি খেয়া-তরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে ?

গন্ধের থালি বর্ণের ডালি
আনে নির্জ্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজা-তরঙ্গ তুলে অম্বর-ময়।

(২)

প্রতিমা না হয় হ'য়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না হয় ধূলায় হ'লো লুণ্ঠিত
আছিলো যে চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয়?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্ন-ভিত্তি-লগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।

বাতাসে পুলকি' আলোকে আকুলি'
আন্দোলি' উঠে মঞ্জরী গুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি'
প্রাচীন তোমার গেহে।

সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি' দিলো তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।

ভিত্তি রন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি' দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

(৩)

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,

নাই মুখরিল পার্ব্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জ্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গ-দল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীব-বৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।

নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরাণে করিছে কূজন,
উৎসব-রসে সেই তো পূজন
জীবন - উৎস তীরে।

নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেলো সন্ন্যাসী সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।

সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,—
প্রসাদ - অমৃত - মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হ'লো যে পুণ্যময়॥

(* মাঘ, ১৩৩০)

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এলো, তাহা
বুঝিতে পারো তুমি ?
শোনোনি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি ?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর ;
"কে এলো" বলি' তরাসি' উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এলো, স্বপনে এলো, এলো সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এলো, কায়াতে এলো, এলো সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি'।

অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছো কি ?"
মর্ম্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
"শোনো গো, শোনো শোনো।"
শামা না জানে প্রভাতী-গানে কি নামে তা'রে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মুহুর্ম্মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তা'রে জানি ?"

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছ্বাসে।
আপন মনে মাধবী ভণে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে !"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
ক্ষ্যাপার মতো কহিছে কা'রে
"বলো তো কী যে করি ?"
শিহরি' উঠি' শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি !"

কেন যে আজি উঠিল বাজি' আকাশ-কাঁদা বাঁশী
জানিস তাহা নাকি ?
রঙীন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি'
কেন যে থাকি' থাকি' ?
অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি' ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনক-চাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন ক'রে কুঞ্জ ভ'রে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তা'রি সাড়া।
সহসা বন-মল্লিকা যে
পেয়েছে তা'রে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তা'রা, গেয়েছে তা'রা জেনেছে তা'রা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধা-বিহীন তানে।

ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,
ভাঙুক মোহ-ঘোর।
বনের তলে নবীন এলো, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভ'রে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা, বাজ্।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে, কবি,
ফুরালো তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি'॥

(❋ মাঘ, ১৩৩০)

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোর-বেলা হ'তে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লব-পুটে মর্ম্মরি' মর্ম্মরি' উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়-সিন্দূর-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।

আম্রের মুকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্য-ছায়ার হিয়া করিছে বিধুর ;
অশ্রুর অশ্রুত-ধ্বনি ফাল্গুনের মর্ম্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিলো সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যেভরা জেগেছিলো বসুন্ধরা,
হেসেছিলো প্রভাত-গগন।
কত না উৎসুক-বুকে পথ-পানে ধাওয়া,
কত না চকিতচক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসন্তেরে ক'রেছিলো চাঞ্চল্যে-মগন,
এসেছিলো সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের সুরে তা'রা মরে ঘুরে ঘুরে,
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তা'দের পরশ পায়, কী মায়াতে ভ'রে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।
তা'দের চমক লাগে চম্পক-শাখায়,
কাঁপে তা'রা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্চ্ছনায় তা'দের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে 	আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি' রহি' 	সে আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে?"

যায় যাক, যায় যাক, 	আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে 	সঙ্গীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্ত্তের নৃত্য-চ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হ'য়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তা'র লও গো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কী জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধ খানি
ছন্দে বাঁধি' গিয়াছে,
সে ফুল বুঝি হ'য়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, সখি, দিয়েছে ও-কি
সুখের কাঁদা দুঃখের হাসি,
দুরাশা-ভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান-গাহনি ?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরাণমন-দাহনি,—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি ?

ডেকেছে, কবে মধুর রবে
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার কর-পরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা .
ক্ষণিক তব দরশে,—

বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিন-শেষের গীতে ;
সফল তা'রে করো সে !
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ কর-পরশে।

রসে বিলীন সে সব দিন
ভ'রেছে আজি বরণ ডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহ মালা
রাখিয়া যাবো চরণে।
একদা তব মনে না র'বে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে মরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে॥

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হ'লো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন দূরে,
মনে প'ড়ে গেলো আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে ব'হে এনেছো কি মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এ-দিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছো বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছো আমার
কঙ্কণ - ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছো বারে বারে।

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছো থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছো এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে ?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছো একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে !

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি ?
কল্পনা-পটে নেশার বরণে
বুলাবো রসের তুলি ?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চ'লে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চ'লে যায়—
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে-দিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়,
সারা হ'য়ে এলো দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তা'রি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিলো যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

শেষ অর্ঘ্য

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষ বেলায়
প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এলো ; দিলো আনি'
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি', কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিলো, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিলো রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরাণ হারায়
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ,
তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে,
কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরাণ বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই ;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

বকুল-বনের পাখী

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখী,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি ?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান অপমান কি পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছো কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছো তোমারি সম,
অসীম - নীলিমা - তিয়াষী বন্ধু মম ?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখী,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কথা কি ?
বালক ছিলাম, কিছু নহে তা'র বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেতো মোরে ডাকি' ডাকি'।
সহজ রসের ঝর্‌না-ধারার পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরাণ ল'য়ে আমি কোন সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চ'লে যেতো অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
দূরে চ'লে এনু, বাজে তা'র বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি' ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি',—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা ল'য়ে
কোনো আঁখিজল যায়নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
আর বার তা'রে ফিরিয়া ডাকিবে না কি ?

যায়নি সে-দিন যে-দিন আমারে টানে,
ধরার খুসিতে আছে সে সকল খানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখী।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
সে-দিন চিনেছো, আজিও চিনিবে না কি ?
পার-ঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হবো পার,
শেষের পেয়ালা ভ'রে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথী,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
মুক্তির টীকা ললাটে দাও তো আঁকি'।
যাবার বেলায় যাবো না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খ'সে যাক নিঃশেষে,

কর্ম্মের এই বর্ম্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্ত্তি যাক না ঢাকি'।
ডেকে লও মোরে নাম-হারাদের দলে
চিহ্ন-বিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি'।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝ'রে,
তারার মতন যাই যেন রাত ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চ'লে যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব - মর্ম্মর - রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে ॥

(ফাল্গুন, ১৩৩০)

পথিক

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি'
ফেলো, ফেলো টুটি'।
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি'।
বহ্নি-বীণা বক্ষে ল'য়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তা'রে জানি
মোর জন্ম-কালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছসি উঠিল মন্দ্রি' বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সঙ্গীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত॥

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তা'রে নমো নমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তা'রি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি'
জীবন হিল্লোল॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী;
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে,—কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিলো বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ - হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কি আমাতে দিয়েছো যে ভ'রে
কেই-বা সে জানে ?
কি জাল হ'তেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে ?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক হাসি কান্না ভাবনা বেদনা,
না বাঁধুক মোরে ॥

তা'রা সবে মিলে থাক অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর - গুঞ্জন - কলরবে
উপল ঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তা'র পরে যেন তা'রা সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে ॥

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কি মত্ততায়, কি আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হ'য়ে বিবাগিনী,
ল'য়ে তা'র ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী ?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তা'র বেলা হ'লো শেষ,
বুকে লও তা'রে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তা'র স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত - সঙ্গীত - ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
ব'লেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি',—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হ'য়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হ'তে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধশোক
মরণের অধিক মরণ"॥

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি'
ব'লেছিনু তোরে কানে কানে,—
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ, বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে, প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্ম্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার"॥

৩

দু'জনের সেই বাণী,
কানাকানি,
শুনেছিলো সপ্তর্ষির তারা ;
রজনী-গন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
ব'হে গেলো সে বাণীর ধারা।
তা'র পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এলো বিচ্ছেদ অপার।
দেখা শুনা হ'লো সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১লা অক্টোবর, ১৯২৪।

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তা'রে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তা'রি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চ'লে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন নিরুদ্দেশে।

নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্ম-বিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হ'তে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।
তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি, আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি',
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কারে
চ'লে যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তা'র বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে॥

কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি'
পত্রপুষ্প-ভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি'
রহস্য-সমুদ্র-তল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥

তুমি সে আকাশ-ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল' অর্গল
বেদনার বেগে;
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি',
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি,
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে ?
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা ব'সে রয়েছো, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি',
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তা'র স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হ'য়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি' করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তা'র পরে যাও যদি যেয়ো চলি'; দিগন্ত-অঙ্গন
হ'য়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্ব্বশেষ লাভ,
সর্ব্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী ?
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চ'লে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরি ;
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চ'লে তা'র স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপার ॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহন-বাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'লো তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯৪২।

ছবি

ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোক-চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্য্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্দ্ধে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসঙ্কোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্য নিঃশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে॥

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তা'র পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগ-রক্ত ছবি।
তুই হেথা, কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি' গানে তা'রে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ,
২ অক্টোবর, ১৯২৪।

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
এক-ই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে ?
প্রত্যূষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্ম্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি করো যে মুগ্ধ মনে ॥

বহুযুগ হ'য়ে গেলো কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠন-খানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্ত্তি দেখা দিলো আঁখির সম্মুখে
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।

নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্য-মত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তা'র বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনান্তরে॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি'
ঊর্দ্ধে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়,।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের ছুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জ্জি' উঠি' কয়,—
জয়, জয়, জয়॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান ;
ঊর্দ্ধ হ'তে তাই নামে গান।
চির-বিরহের নীল পত্রখানি পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তা'রে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি',—
মধুবিন্দু হ'য়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তা'রে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখো তা'রে ভরি' ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি', নারিকেল পল্লবে মর্ম্মরি',
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জ্জন নির্ঝরে॥

বিরহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেলো ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হ'য়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্ম-বিদ্রোহের অসন্তোষে।
তা'র পরে আর বার ব'সে ব'সে
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চ'লে যায়॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
ব'সে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসন প্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।

শরতে দিগন্ত-তলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সঙ্গীতে তা'রি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে-কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তা'রি রিনিরিনি,
ওগো বিরহিণী।
দূর হ'তে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তা'রি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হ'তে মিলনের সুধা
মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সঙ্গোপনে রেখেছো, বসুধা;
তা'রি লাগি' নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
৪ অক্টোবর, ১৯২৪।

ক্ষণিকা

খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
ল'য়ে তা'র ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিলো সর্ব্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
আমার গানের ছন্দ গোপনে ক'রেছে অধিকার ;
দেখি তা'রি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি' ॥

বিরহের দূতী এসে তা'র সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল' আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত্ত বাজিয়াছিল ; তা'র পরে শব্দহীন রাতে
বেদনা-পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী ॥

সেদিন ঢেকেছে তা'রে কি এক ছায়ার সঙ্কোচন,
নিজের অধৈর্য্য দিয়ে পারেনি তা করিতে মোচন।
তা'র সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চ'লে গেলো, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তা'র সে অবগুণ্ঠন ॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি',
বারেক ফিরায়ে মুখ পথ-মাঝে দাঁড়াতে থমকি',
তা হ'লে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হ'লে পরম লগ্নে, সখি,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি' ॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্ত্তখানি প'ড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভাণ ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হ'লো যে অবসান॥

গেলো না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে,
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্ত্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা ;—সে মূর্ত্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হ'তে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হ'তে নামে পৃথ্বী পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হ'তে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা॥

হারুনা মারু জাহাজ,
৬ অক্টোবর, ১৯২৪।

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় ক'র্‌লে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী ?
হঠাৎ কেন চ'ম্‌কে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি ?
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয় ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি ॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল' বুঝি
লুকোচুরির ছলে ?
বনের পারে আবার তা'রে কোথায় পেলে খুঁজি'
শুক্‌নো পাতার তলে ?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে ব'সে আমার পাশে
সকাল বেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল্ চোখের জলে,—
কাঁপ্‌তো যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুক্‌নো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথী আন্‌তো ভ'রে সাজি
সোনার চাঁপা ফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তা'রি ঐ যে আসে আজি
এ কি পথের ভুলে?
বকুল-বীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাক্‌তে এলো আবার ফিরে এসে?
সেই সাজি তা'র দখিন হাতে, তেম্‌নি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হ'তে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা?
চাও কি তুমি যেমন ক'রে হ'লো দিনের সুরু,
তেম্‌নি হবে সারা?
সে-দিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব ক্ষ্যাপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে
ক'র্‌বে দিশেহারা।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তা'র ছুটে
তেমনি হবো সারা॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চ'ল্‌তি কাজের স্রোতে
চ'ল্‌তে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাকো ?
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাকো ?
না-জেনে পথ পড়্‌বো তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাকো ॥

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধ-প্রদীপ জ্বালো,—
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
৭ অক্টোবর, ১৯২৪।

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চ'লে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হ'লো গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধূলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখী যখন গান যাবে তা'র ভুলি'
হয়-তো তুমি আপন-মনে আসবে সোনার রথে
শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের পথে॥

পুলক লেগেছিলো মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্‌ মধুরের ডাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়-তো তুমি এসেছিলে, যায়নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয়নি প্রাণের জানা॥

হয়-তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে।
হয়-তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার ক'রেছিলো ক্ষণেক দুরু দুরু ;
সেদিন হ'তে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রঙিয়েছিলো হয়-তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হ'য়েছে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয়নি জানা-শোনা ॥

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজ্‌লো যে-দিন দূর চরণের ধ্বনি
সে-দিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
দখিন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি'
সে-দিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি ;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিলো গান ॥

এ গানগুলি তোমার ব'লে চিন্‌বে কখনো কি ?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয় ;

যারে তুমি বাস্‌বে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ ক'রে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফির্‌বে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিল্‌বে তাহার বাণী॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভ'র্‌বে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাবো চ'লে?
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল-বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছাভরা;
হয়-তো সে-দিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা;
হয়-তো সে-দিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সে-দিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান;
তোমার লাগি' রেখে গেলেম গান॥

আন্দেস্ জাহাজ,
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

আন্‌-মনা

আন্‌-মনা গো, আন্‌-মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আন্‌বো না।
বার্ত্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝ্‌বে কবে ?
তোমারো মন জান্‌বোনা,
আন্‌-মনা গো আন্‌-মনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেবো তোমায় শান্তস্বরের সান্ত্বনা
আন্‌-মনা গো আন্‌-মনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফির্‌বে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে র'ইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুন্‌বে ব'লে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখী
নীল আকাশের বিরামখানি রাখ্‌বে ডানায় ঢাকি' ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁক্‌বে মেঘে মুছ্‌বে আবার শেষ বিদায়ের ছবি ;

স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা ;—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তা'র সাড়া
তোমার উদার আঁখি-তারার পারে ;
কনক চাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাব্না যদি ফুল-বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়্বো তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে ব'সে একমনে
এঁকে যাবো আমার গানের আল্পনা,
আন্-মনা গো আন্-মনা॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪।

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তা'রে সাজিয়ে রাখাই ভুল,
মিথ্যা কেন কাঁদিয়ে রাখো তা'কে ?
ধূলায় তা'রি শান্তি, তা'রি গতি,
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তা'রে
ভুলো একেবারে ॥

মাঘের শেষে নাগ্‌-কেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া ;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ঐ কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুক্‌নো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ ॥

যদি বা তা'র ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই ;
ক'রেছিলো ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিলো ক্ষণকালের ঠাঁই।

অলকে সে কানের কাছে তুলি'
ব'লেছিলো নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ-ভুলে
তোমার এলোচুলে ॥

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয়নি কোনোখানে ?
কাহিনী তা'র থাক্‌বে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফির্‌বে না কি তাহার মরীচিকা ?
অশ্রুতে তা'র আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি ॥

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তা'র লাগি' শোক, সে-ও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি'—
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে ॥

আন্দেস্‌ জাহাজ
১৯ অক্টোবর ১৯২৪।

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখা-পড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙা গড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল উঠে, ইঁটের পরে ইঁট।
কীর্ত্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মশ্‌লা যেমন জোটে,
মোটের পরে একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে॥

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুন্‌তে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
এক্‌টুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের-ছায়ায়-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাবো ; যখন তা'রে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনখানেই নাহি।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হ'লো উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ॥

বহুদিন মনে ছিলো আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
ক'রেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা ;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
ক'রেছিনু আশা ॥

বহুদিন মনে ছিলো আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
ক'রেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,

আপন স্বপন-লোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি' দিব' তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
ক'রেছিনু আশা॥

বহুদিন মনে ছিলো' আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তা'র শেষ সুধা ;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
ক'রেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা ব'সে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
ক'রেছিনু আশা॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪।

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝ্‌তে কেবা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে ?
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজো ;
সেই প্রভাতের আলো এলো, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুসুম ॥

পাখী বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে ?
বাতাস বলে, ওগো পাখী, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজো ;
সেই আকাশে জাগ্‌লো আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি'
সীমাহীনের বাণী ॥

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝ্‌তে নারি কী যে তোমার কথা,
কিসের লাগি' এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজো;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে॥

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজো;
সেই বসন্ত এলো পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি॥

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো আমাদের, কী চাও তুমি নিজে?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজো,—
আমি শুধু যাই চ'লে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২০ অক্টোবর, ১৯২৪।

স্বপ্ন

(১)

তোমায় আমি দেখিনা কো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি?"
কি জানি গো, হয়-তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই-জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়-তো হেরি তোমার চোখে
আদি যুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়া-বীথি।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ও-পারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়-তো হবে সত্য তাই,
হয়-তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মত্ততাই॥

(২)

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তা'র চেয়ে কি সত্য আছে?
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।

সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তি-সাধন,
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্ত্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই॥

(৩)

আপ্‌নি তুমি দেখেছো কি আপন মাঝে সত্য কি যে?
দিতে যদি চাও তা কা'রে, দিতে কি তাই পারো নিজে
হয়-তো তা'রে দুঃখ দিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বাল্‌বে শিখা।
অমৃত যে হয়নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।

নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে।
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি সত্য তাই,
মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই॥

(৪)

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক্ বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলা-ফেলার ভিড়ে।
ছল ক'রে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস্‌নে তা'কে,
ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস্‌নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধূলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গ'ণে গ'ণে আপন মনে কাটাস্‌নে দিন মিছে মিছে।
কি হ'বে তোর বোঝাই ক'রে ব্যর্থ দিনের আবর্জ্জনা;
স্বপ্ন শুধুই মর্ত্ত্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যা'রে,— অসীম পথের পথ্য তাই॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২০ অক্টোবর, ১৯২৪।

সমুদ্রে

১

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জ্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হ'লো গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা;
যুগ-যুগান্তর ধরি' নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি' কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহা-দ্বীপ কত মহা-বন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্ন-হারা যুগগুলি
মূর্ত্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি'
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তা'র
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন তুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছো আবর্জ্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জ্জন॥

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল-মরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ উর্দ্ধলোকে
চাহিলাম; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শূন্য-মাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেলো স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসব দিনে। যুগ-সন্ধ্যা কবে এলো তা'র,
ডুবে গেলো অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তা'র আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল॥

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে;
কোথায় সঞ্চয় তা'র, অন্ত তা'র কোথায় কে জানে।

ওই শোনো সংখ্যা-হীন সংজ্ঞা-হীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল' রূপ, ছিল' বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিলো কোন্ জন্মে ;—দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙা
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙা
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারালো তা'রা,
আবাস তা'দের নাহি। খ্যাতি-হারা সেই স্মৃতি-হারা
সৃষ্টি-ছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলা ঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্ত্তি তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল' কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে ॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২১ অক্টোবর, ১৯২৪।

মুক্তি

নানা মূর্ত্তি ধরি' মুক্তি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ॥

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।

তা-হ'লে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল ;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোছুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়॥

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাবো আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।
সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন,
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা।
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা॥

সঁপি' দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্ত্তি, একান্তে করিয়া মাথা নীচু
শুনিব তাহারে।

দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে ;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে ;
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;
নীড়ে-ধাওয়া পাখীর ডানায়
সায়াহ্নগগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়॥

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবস রাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ-যাত্রীর
আলোক বেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হ'বে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চির-বাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২২ অক্টোবর, ১৯২৪।

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ-ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুল্‌ছে কাপড় pegএ,
বিজ্‌লি-পাখার হাওয়ার ঝাপট্‌ লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিষ-পত্র আছে কায়-ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের,
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আস্‌বাব্‌
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম,
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজ-চলাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাক্‌তে পারে কেবা?
কষ্ট ব'লে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে ব'সে,
কি জানি কোন্‌ দোষে

ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হ'তে ক'রেছে এক-ঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্রদুখের ক্ষুদ্রফাটল্ বেয়ে
কেমন ক'রে এলো হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হ'তে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা ;
এক নিমেষে আমারে সে ক'র্‌লে আত্মহারা
আন্‌লে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আন্‌লে আপন গর্জ্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়-ঘোষণারে।
মহাদেবের তপের জটা হ'তে
মুক্তি-মন্দাকিনী এলো কূল-ডোবানো স্রোতে ;
ব'ল্‌লে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে—
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
ব'ল্‌লে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুজয়ের ডমরু-রব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালেব তাণ্ডব-তাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।

স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেলো ছুটে।
রোগশয্যা মম
হ'লো উদার কৈলাসেরি শৈলশিখর সম।
আমার মন-প্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরি জয়গান :—

সুপ্তির জড়িমা-ঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
ক'রেছিস্ ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জ্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা ব'লেছিলি তাকে
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখীর ডাকে
তরুর মর্ম্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফ'লেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হ'য়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"
ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘ-মন্দ্রে,—
"নয়, নয়, নয়॥"

সমুদ্রে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে

মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"
আমি যে সে প্রচণ্ডেরে
ক'রেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,—
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি', লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত—
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়॥"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে,—
ব'লেছিলি মাথা খুঁড়ে,—
"এ দেখি প্রলয়।"
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পারো, তাই
রয়, রয়, রয়।"
চ'লেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।

ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তা'রে খোওয়া তা'রে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তা'রে, তা'রি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়॥"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্চার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দূর, দূর, দূর।"
গাহে "পশ্চাতের কীর্ত্তি,
সম্মুখের আশা,
তা'র মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস্‌নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।

যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়-ডঙ্কা
দূর, দূর, দূর ॥"

এসো গো ধ্বংসের নাড়া,
পথ-ভোলা, ঘর-ছাড়া,
এসো গো দুর্জ্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
"নয়, নয়, নয়।"

আবেশের রসে মত্ত
আরাম-শয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্ম-সঙ্কোচ নিত্য গুপ্ত হ'য়ে রয়,
হানো তা'রে, হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয় ॥"

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪।

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেই-মতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি?
মোর জন্ম-নক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্ত্তা ল'য়ে ফিরিছে কি পথে?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি?
অজানার যাত্রী কে গো? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

এই কি নির্ম্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চির দিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে?
এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি' মোর
শয্যার বন্ধন মোহ, এ রাত্রি বেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান্-খেলায়?
হোক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি, জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা;
ভুলায়ে পূর্ব্বের পথ অপূর্ব্বের পথে দ্বার খোলা;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তা'রি ছিন্ন রসিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে

বার বার গাঁথা হ'লো দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্ত্তের ভোলা
চির-স্মরণের ধন
গোপনে হ'য়েছে আয়োজন।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারেবারে ?
একি বাজে মৃত্যু-সিন্ধু-পারে ?
একি মোর আপন বক্ষেতে ?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সঙ্কেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?
সব বন্ধ করিব ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছে বেদন
বিচ্ছেদের তীর হ'তে ?
তরী কি ভাসাবো স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি'
ডাকো মোরে কি খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথ বেলাতে ?

বারে বারে দিয়েছো নিঃসঙ্গ করি';
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি'
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে?
সূর্য্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্র-সভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কি সঙ্কেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চ'লে যায়?
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি?
তা'রে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি?
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কি শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী?

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪।

প্রকাশ

খুঁজ্‌তে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে পথ আমায় দাওনি তুমি ব'লে।
বাহির দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চ'লে।
এই ছবি মোর ছিল মনে,
নির্জ্জন মন্দিরের কোণে,
দিনের অবসানে
সন্ধ্যা-প্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যা-তারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি'
নিশীথ রাতে র'ইলো জাগি',
খুল্‌লো না তা'র দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপ্‌নিও পথ পাওনি খুঁজি',
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার॥

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।
কাঙাল স্বরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কি ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জানো না যে
তোমার মনের তীর্থ-মাঝে
পূজা হয়নি আজো।
দেবতা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কি সাজ তুমি সাজো।
হ'লো সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠ-হারের মাণিক গাঁথা,
প্রমোদ রাতের গান,
হয়নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধূলার তলে
আপন ভোলা সকল-শেষের-দান॥

ভোলাও যখন, তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার পরে;
ভুল্‌বে যখন, তখন প্রকাশ পাবে,—
ঊষার মতো অমল হাসি জাগ্‌বে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।

ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান ;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তা'র নাইরে পরিমাণ
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝ্‌বে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আস্‌বে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ ॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪।

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব্ব বেশ,
কী মহিমা !
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'
যায় গলি',
গ'ড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার।
হয় সে অমৃত-পাত্র, সীমার ফুরালে অহঙ্কার।
শেষের দীপালী রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ ॥

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারা-হারা রাত্রির বীণার
চরম ঝঙ্কার।

যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ-পথ ঘুরি'
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ ক'রে যায় তা'র,
উদয়-সূর্য্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্ম্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ,
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার-সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে—
তখন সোনার পাত্র হ'তে
কি অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্য্য-ধারায়?
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তা'রে শুভ্র সমুজ্জ্বল।—
হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
ভার-মুক্ত তা'র সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোলো তা'র শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তা'রি লাগি', অন্তর তৃষিত—
কতদূরে আছে সেই খেলা-ভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে,
বেণু-চ্ছায়া-ঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হ'তে
সুধা-স্রোতে
ভ'রে নিতে চায় তা'র দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শ-ঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হ'তে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি' অগ্নি-মহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বাসিত রুদ্র হাস্যে করি' দিবে শেষ দীপ্যমান॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪।

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন শিশুকাল হ'তে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চির-জনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুট্‌লো আমার, একটি কেবল রইলো বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধ্‌লো মোরে॥

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চ'ম্‌কে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, ব'সে থাকি আপন মনে;—
পারের পাখী আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে॥

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তা'র পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে?
গুঞ্জরিয়া মর্ম্মরিয়া কী ব'লে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে॥

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন সুদূরে
ঘর-ছাড়া মোর ভাব্‌না বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তা'রে যখন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তা'র বাজায় কভু গুণ্‌গুণিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে॥

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠ্‌লো হাওয়া,—
এবার তবে হোক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হ'লো ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রসি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে॥

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাওনা দেখা,
সময় হ'লো একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার॥

আণ্ডেস্‌ জাহাজ,
২৮ অক্টোবর, ১৯২৪।

অবসান

পারের ঘাটা পাঠালো তরী ছায়ার পাল তুলে
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হোক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে ॥

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
অশ্রু-ঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে,—
আজিকে তা'রা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সঙ্গীতে ॥

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব,
বলো, কী আমি কবো।
দিনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝ'রে
তাহারি শেষ নিঃশ্বাসে কি বাঁশিটি নেবো ভ'রে?
অথবা ব'সে বাঁধিব সুর যে-তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে॥

সন্ধ্যা মম, যে পার হ'তে ভাসিল মোর তরী
গাবো কি আজি বিদায় গান ওরি?
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাবো অজানারে?
বলিব,—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৩০ অক্টোবর, ১৯২৪।

তারা

আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যা-রবির রাগে
সিন্ধু-পারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নাম-হারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

জোয়ার ভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এম্‌নি ক'রে পথে পথে অনেক হ'লো খোঁজা,
এম্‌নি ক'রে হাটে হাটে জম্‌লো অনেক বোঝা ;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তা'র ভাষা কি ভুলেছি কোন্-খনে ?
পড়্‌বে না কি মনে ?
ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখ্‌লো কোথায় জ্বেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাবো না তা'র দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয়নি কি দ্বার নাড়া—
পাইনি কি তা'র সাড়া ?
বাতায়নের মুক্ত-পথে স্বচ্ছ শরৎ রাতে
তা'র আলোটি মেশেনি কি মোর স্বপনের সাথে ?
হঠাৎ তা'রি সুরখানি কি ফাগুন হাওয়া বেয়ে
আসেনি মোর গানের পরে ধেয়ে ?

কানে-কানে কথাটি তা'র অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তা'রি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্-মনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্য-হারার দলে।
বাসায় এলো পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাস্‌লো ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগ্‌লো বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধন-হারা শ্রাবণ-ধারা পাতে।

ফিরে যাবার সময় হ'লো তাইতো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসা-হারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে ;
সুর ঘুমালো নীরব নীড়ে, গান হ'লো মোর সারা,
কোন্‌ আকাশে আমার আপন তারা ?

আণ্ডেস্‌ জাহাজ,
১ নভেম্বর, ১৯২৪।

কৃতজ্ঞ

ব'লেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হ'লো। সেদিনের চুম্বনের পরে
কত নব বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোত-কাকলি
তা'রি পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এলো গেলো চলি'
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিলো প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের পরে
চঞ্চল আলোক ছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তা'রি পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতি মুহূর্ত্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকা-চোরা নানা চিত্তে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতি-লিপি চিত্ত-পটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি' পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হ'তে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে।

তবু জানি, এক দিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিলো ফ'লে,
আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হ'তে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তা'র মর্ম্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কি পরশ-মণি রেখে গেছো অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃত-ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি'
হৃদি-মাঝে ; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি,—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি'
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জল-পাত্র নিয়েছে সে
মুখ হ'তে, কতবার ছলনা ক'রেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে,—সব তা'র ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রী-হীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,

২ নবেম্বর, ১৯২৪।

দুঃখ-সম্পদ্

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দ্দিনে চিত্ত উঠে ভরি',
দেহে মনে চতুর্দ্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হ'তে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখ-বেদনায়।
তখন সে মহা অন্ধকারে
অনির্ব্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৪ নভেম্বর, ১৯২৪।

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হ'য়েছিলো তোর সকলের কোলে
আনন্দ-কল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখী,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহ-মাঝে গৃহীরে আহ্বান॥

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জ্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জ্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্য-ছন্দে নিত্য-কাল বাজিতেছে ভেরী।

অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্ম্মর,
বিদেশের বিবাগী নির্ঝর
বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।
দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্ব্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথ-রাত্রি রহিবে নির্ব্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৪ নভেম্বর, ১৯২৪।

দান

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয় তো খুসি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখ্‌লে ক্ষণেক তরে,
প'রেছিলে হয়-তো গিয়ে ঘরে,
হয় তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটী দেখি নাই তো হাতে,
হয়-তো এলে ভুলে॥

দেয় যে জনা কি দশা পায় তাকে?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে?
পাকা যে ফল পড়্‌লো মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তা'রে কি আর স্মরণ করে পাখী?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন ক'রেই তা'রা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি॥

নিতে যারা জানে তা'রাই জানে,
বোঝে তা'রা মূল্যটি কোন্-খানে।
তা'রাই জানে বুকের রত্ন-হারে
সেই মণিটি ক'জন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তা'রে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যা'রে কহে
সহজ ব'লেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তা'রে মেলে॥

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্ খনিতে কোন্ ধন-ভাণ্ডারে,
সাগর-তলে কিম্বা সাগর-পারে,
যক্ষরাজের লক্ষ মণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই-তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ ক'রেই কর্‌বে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৩ নভেম্বর, ১৯২৪।

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাকো চরমের পরম উদ্দেশ ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে ;
অস্ত-রবি যদি তোরে ডাকে
দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় ;
সুন্দরের শেষ অর্চ্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যা-তারা
অসীমের বাতায়ন-তলে
শান্তির প্রদীপ-শিখা দেখায় কেমন ক'রে জ্ব'লে ;
যদি রাত্রি তা'র
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সঙ্কেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগর-সঙ্গম তীর্থ-তীরে ;
সেই শতদল হ'তে যদি গন্ধ পেয়ে থাকো তা'র
মানস সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার ॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৫ নভেম্বর, ১৯২৪ ।

ভাবী কাল

ক্ষমা কোরো যদি গর্ব্ব-ভরে
মনে মনে ছবি দেখি,—মোর কাব্যখানি ল'য়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি'।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়-তো ভাবিছো, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়-তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তা'রি লাগি' তবু
মোর বাতায়ন তলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৬ অক্টোবর, ১৯২৪।

অতীত কাল

সেই ভালো প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তা'র গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘ-শ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তা'র মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
অতীতের সূর্য্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণ-চ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর সাগরের দ্বীপান্তর হ'তে বহি' আনে।
যেন কি অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,—
মিলনের রাতে ॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৭ নভেম্বর, ১৯২৪।

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে,—
সূর্য্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে;—
ফেন-পুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খল খল,
দোলে টল মল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেই-মতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর॥

আণ্ডেস্ জাহাজ,
৭ নভেম্বর, ১৯২৪।

শীত

কেন শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এলো
গানের বেলা শেষ না হ'তে হ'তে ?
আমার মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিলো শুক্‌নো পাতার স্রোতে।
আমার মনের কথা যত
তা'রা উজান তরীর মতো ;
পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা ব'সে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে॥

কেন ঘোরে তা'রা শুক্‌নো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ুভরে ?
কেন ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়ি তা'দের ঢাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের পরে ?
তাদের হ'লো কি দিন সারা ?
এখন বিদায় নেবে তা'রা ?

এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তা'রা পোউষ রাতে
ধূলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
ব'সে আছো আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ?

আমার মন যে বলে, নয় কখনই নয়,
ফুরায়নি তো, ফুরাবার এই ভান ;
আমার মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে, ফিরে আসার গান।
আমার ভরা-মনের কথা ;
তাদের শীর্ণ শীতের লতা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,
ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণ মূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা ব'সে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১০ নভেম্বর, ১৯২৪।

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এলো কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?
সে যে অনেক দিনের কথা ॥

আজকে মনে প'ড়েছে সেই নির্জ্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এলো আমার অধর পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখীর মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জ্জন অঙ্গন ॥

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা।
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিলো গায়ে ;
চাঁপা কুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা ॥

সেই সেদিনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,

মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি ॥

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুট্‌লো না তা'র মুকুলগুলি,
শুধু তা'রা হাওয়ায় দুলি'
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস ॥

ঝ'রে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তা'র গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠ্‌লো ফুটে তা'র সে-দিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা ॥

পারে যাওয়ার উধাও পাখী সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি'
শূন্য আকাশ দিলো পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তা'র বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা ॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১১ নভেম্বর, ১৯২৪।

প্রভাত

স্বর্ণ-সুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পথের মাঝে একান্ত একেলা ব'সে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্ত্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি' যেথা হ'তে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি';
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি'

সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হ'তে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্ম-মৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি'
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্ম্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব্ব অঙ্গ ক'রেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১১ নভেম্বর, ১৯২৪।

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়॥

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধ'রে
শুধালেম, বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাকো,
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো"।

বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাকো কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই॥

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার?"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্ম্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশ্বাসে ভ'রেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা"॥

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে—
শুধালেম, "চেনো তুমি মোরে?"
হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে এক রতি
নাহি কারো ক্ষতি।

কহিলাম, বোঝোনি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভ'রেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী ॥

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি ?
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চ'লে যাবো দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হবো তব চেনা ;—
মোরে ভুলিবে না ॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১২ নভেম্বর, ১৯২৪।

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি' দিলে, নারী,
মাধুর্য্য সুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূর-দেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হ'তে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জ্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
ঊর্দ্ধ হ'তে একতানে এলো প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হ'তে যেদিন কোলেতে নিলো ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি।"
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

বুয়েনোস্ এয়ারিস্ ,
১৫ নভেম্বর, ১৯২৪।

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিলো,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিলো,
ছিলো না কেউ সাথী।
মনে হ'লো অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির দ্বারে,
মনে হ'লো শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজ্‌লো বুঝি
কঙ্কণ-ঝঙ্কার॥

বারেক শুধু মনে হ'লো
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি'।
"কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে ব'সে আছে?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধালো যবে,
ব'লেছিলেম আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে॥

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জান্‌লা হ'তে আমায় যেন
ডাক্‌লো ইসারাতে।
মনে হ'লো, শয়ন ফেলে
দিই না কেন আলো জ্বেলে,
আলসভরে রইনু শুয়ে
হ'লো না দীপ জ্বালা।
প্রহর পরে কাট্‌লো প্রহর,
বন্ধ রইলো তালা॥

জাগ্‌লো কখন দখিন হাওয়া
কাঁপ্‌লো বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠ্‌লো মর্ম্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্চ্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেলো, আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন্‌
ভ'র্‌লো নয়ন ঘুমে॥

ভোরের তারা পূব-গগনে
যখন হ'লো গত
বিদায় রাত্রির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হ'লো তবে,
যেন কাহার করুণ-রবে
শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠ্‌লো কেঁপে কেঁপে ॥

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার,
হায় রে, ধূলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ঐ যে দূরে, নয়ন নত
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেলো
অরুণ আলোয় মিশে,
ঐ বুঝি মোর বাহির দ্বারের
রাতের অতিথি সে ॥

আজ হ'তে মোর ঘরের দুয়ার
রাখ্‌বো খুলে রাতে।
প্রদীপখানি র'ইবে জ্বালা
বাহির জানালাতে।
আজ হ'তে কার পরশ লাগি'
পথ তাকিয়ে র'ইবো জাগি';
আর কোনোদিন আস্‌বে না কি
আমার পরাণ ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে?

বুয়েনোস্‌ এয়ারিস্‌,
১৬ নভেম্বর, ১৯২৪।

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু'হাত ভ'রে
যতই দেবে বেশি ক'রে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপ্‌নি ধরা প'ড়্‌বে না কি ?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি'
যাইনা নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রবো ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যেয়ো ॥

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে ;
ভুল্‌তে যদি পারো তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভুলে ॥

বিজন পথে চ'লেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায় সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হ'লো যে আমার মনে।
দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে॥

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠ্‌বে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই-তো আমি বলি তোমায় নত শিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাবো ফিরে॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১৭ নভেম্বর, ১৯২৪।

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পূরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাবো মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কানন-তলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার ॥

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সঙ্কোচভরে বসন্ত-শেষের দিন মম ॥

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে ;
তোমার বিকচ ফুল-বনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে ।
চাবো না তোমার চোখে আঁখি জল পাবো আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা রসে ভরি' ॥

ফিরিয়া যেয়োনা, শোনো শোনো,
সূর্য্য অস্ত যায়নি এখনো ।
সময় র'য়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো ।
পাতার আড়াল হ'তে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধ'রে, ঝলুক তোমার কালো কেশে ॥

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্ম্মম উল্লাসে,
বন-সরসীর তীরে
ভীরু কাঠ-বিড়ালীরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে ।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি' ওই তব চঞ্চল চরণ ॥

তা'র-পরে যেয়ো তুমি চ'লে
ঝরা-পাতা দ্রুতপদে দ'লে
নীড়ে-ফেরা পাখী যবে
অস্ফুট কাকলী রবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি' তোলে।
বেণুবনচ্ছায়া-ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্ব্বশেষ সুরে॥

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাবো, প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী॥

বুয়েনোস এয়ারিস্,
২২ নভেম্বর, ১৯২৪।

বিপাশা

মায়া-মৃগী, নাই-বা তুমি
পʼড়্‌লে প্রেমের ফাঁদে।
ফাগুন রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধন-কাটা ভাব্‌না তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহ মনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।
ঝর্‌ণা-ধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই-বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি ?
শরৎ প্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ আভার
সোনার হাসি-ছোঁওয়া;
শূন্য পথে মনোরথে
ফেরো আকাশ পার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রু জলের ভার ?

এম্‌নি ক'রেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা ;
ছুটির স্রোতে যাক না ভেসে
হাল্‌কা খুসীর ভেলা।
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
নাম্‌বে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়্‌বে কেন
দূরের দুরাশাতে ;
তোমার পায়ের নূপুর খানি
বাজাক্‌ নিত্য কাল
অশোক বনের চিকণ পাতার
চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
জোনাক যেমন জ্বলে
তেম্‌নি তোমার খেয়ালগুলি
উড়ুক স্বপন তলে।
যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে,
ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।

সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিঘ্নটিকে।
গন্ধ তোমার হোক না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাব্‌না কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদন-ভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধ'র্‌তে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে॥

বুয়েনোস্‌ এয়ারিস্‌,
২২ নভেম্বর, ১৯২৪।

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্ম্যের মতন
শুধু তা'র বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানা-মতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জ্জন অন্তঃপুরে
তালা তা'র বন্ধ করি' চাবিখানি ফেলি' দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে, "খুলে দাও"। উপায় জানিনা খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধূলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা-যাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।
আষাঢ়ের আর্দ্র বায়ু ভরে
কদম্ব কেশরে
চিহ্ন তা'র পড়ে ঢাকা।
চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা।

সেথায় লাজুক পাখী ছায়া-ঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।
সন্ধ্যা তারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদ-ধ্বনি দক্ষিণ বাতাসে।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরী বাজাই আমি কুসুম-সুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা
মনে করি যদি কভু পাই তা'র দেখা
যে পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী;
সেই হ'তে ফিরিতেছে বিরাম না জানি'।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথ-প্রান্তে এসে
যাত্রা তা'র হবে অবসান;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
২৬ নভেম্বর, ১৯২৪।

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তা'র ধ্বনি,
নাই তা'র তরঙ্গ-ভঙ্গিমা;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তা'র নাই কোনো সীমা;
অমাবস্যা রজনীর
সুপ্তি - সুগম্ভীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্য-তট হ'তে
দণ্ড পল খ'সে খ'সে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিলো এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেলো কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথী,

দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হ'তে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,
অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জ্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হ'য়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হ'য়ে উঠে
শ্রবণের পর-পারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে সুন্দর ব'সেছিলো মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্ম-বেশে,
যে চির-মধুর
দ্রুতপদে চ'লে গেলো নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তা'রা অনন্তের সুর।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হ'য়ে গেছে গত,
চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তা'রা নক্ষত্র-মালিকা;
অনির্ব্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
২৭ নভেম্বর, ১৯২৪।

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চ'লে যাও থাকি থাকি।
হৃদয় কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি' দেয় তা'র গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তা'র বেণু;
বলে, এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধু সঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ ক'রে,
এসো এ-বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে॥

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন-বেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছল-ছলি'
এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হের' কী আশায় মাতি'
আছে অঞ্জলি পাতি'॥

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হ'তে নাহি জানি॥

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাওনি কি সংবাদ?

জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটেনি কি সে বারতা ?
শোনোনি কী গাহে পাখী ?
হে কালো কাজল আঁখি ॥

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণু শাখাগুলি খনে খনে টল মল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেলো ফুল দল
কিছু না রহিল বাকি ।
এলো যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি',
হে কালো কাজল আঁখি ॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১ ডিসেম্বর, ১৯২৪ ।

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জন-স্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন্ করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়েনি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্ম্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তা'র, তা'রি কক্ষ আছে শুধু শেখা॥

পাখীর মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে ;
আকাশের বক্ষ হ'তে ডানা ভরি' তা'র
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ ॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪ ।

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হ'লে টানে আরো নীচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হোক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়

আলো যেমন চম্‌কে বেড়ায় আম্‌লকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণু-শাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি' লুট
শেষ না হ'তেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।

আমি ভাবি এই বা কি কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইলো না হয়, ছন্দটা তো আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহু বন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে॥
বুঝ্‌তে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিতো একটুখানি॥
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তা'রি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাবো চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে॥

কবি ব'লে লোক-সমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।

পলাতকার দল যত সব দখিন হাওয়ার চেলা
আপনি তা'রা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরি হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগ্‌ড়ু বোকার বরণ-মালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি' ॥

এমন দিনও আস্‌বে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফির্‌বে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্ম্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজ্‌বে আপন ভাষা।
দেখ্‌বে তখন ঝগ্‌ড়ু বোকা কী ক'র্‌তে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে ॥

বুয়েনোস্‌ এয়ারিস্‌,
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

অদেখা

আসিবে সে, আছি সেই আশাতে।
শোনো নি কি, তুজনাকে
নাম ধ'রে ঐ ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে ?
সুর বুকে আসে ভাসি',
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ও-পারের বাসাতে।
ফুল ফোটে বন-তলে
ইসারায় মোরে বলে
"আসিবে সে"; আছি সেই আশাতে ॥

এলো না তো এখনো সে এলো না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে ডাক শুনিনু ভোরে,
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা ?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে সুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এলো না ॥

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেবো ভরা নদী,
ব'সে আছি, আজো তরী ভাসেনি।
মিলায় সিঁদুর আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে ব'সে আছি,
যারে দেবো, এখনো সে আসেনি॥

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।
বুঝিয়াছি অনুভবে
বন-মর্ম্মর-রবে
সে তা'র গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে॥

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

চঞ্চল

হায়রে তোরে রাখ্‌বো ধ'রে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল সেই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে
এলো তুফান সর্ব্বনাশা।
মনে আমার ছিল যে রে
ঘির্‌বো তোরে হাসির ঘেরে;—
চোখের জলে হ'লো ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা॥

এবার আমি সব-ফুরানো
পথের শেষে
বাঁধ্‌বো বাসা মেঘের দেশে।
ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নব
বদল কো'রো মূর্ত্তি তব
রঙ্‌-ফেরানো মায়ার বেশে।

কখনো বা জ্যোৎস্না-ভরা
কখনো বা বাদল-ঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আস্‌বে ভেসে॥

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে ব'য়ে,
শৈল-পাষাণ যায় তো ক্ষ'য়ে।
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্ব্ব-ভরে
থাক্‌তে যে চায় অচল হ'য়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তা'রা,
হারায় যারা র'য়ে র'য়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইবো স'য়ে॥

বুয়েনোস্‌ এয়ারিস্‌,
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

প্রবাহিনী

দুর্গম দূর শৈল-শিরের
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি ;
আপ্‌না-হারা ঝর্‌না-ধারা
ধূলির ধারায় যাই যে নামি'
সরোবরের গম্ভীরতায়
ফেনিল নাচের মাতন ঢালি ;
অচল শিলার ভ্রূ-ভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।
মন্দ্র-সুরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চ হাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দ-মালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।

বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
আমার বেণী ধরিতে চায়;
সূর্য্য-কিরণ শিশুর মতন
অঙ্ক আমার ভরিতে চায়।
নাই কোনো মোর ভয়-ভাবনা,
নাই কোনো মোর অচল রীতি।
গতি আমার সকল দিকেই,
শুভ আমার সকল তিথি।
বক্ষে আমার কালোর ধারা,
আলোর ধারা আমার চোখে·
স্বর্গে আমার সুর চ'লে যায়,
নৃত্য আমার মর্ত্ত্যলোকে।
অশ্রু-হাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগর-মাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

আকন্দ

সন্ধ্যা আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিলো গগন পারে
অকূল অন্ধকারে,
ছম্‌ছমিয়ে এলো রাতি ভুবন-ডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়াল-পাড়ার বাটে।
নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেবো ব'লে দিমুর হাতে আনি
মনে নিয়ে স্থরের গুন্‌গুনানি
চ'লেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিলো বিনা-ভাষার বাণী ;
ব'ল্‌লে আমায় "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি' চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে।
সেই স্থলগন এলো এত দিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধ্‌বো আমার বাসা।"
দেখা হ'লো, চেনা হ'লো সাঁঝের আঁধারেতে,
ব'লে এলেম, তোমার আসন কাব্যে দেবো পেতে।
সেই কথা আজ প'ড়্‌লো মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগর-পারের দেশে,—

মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে
তা'রি মধ্যে বাজ্‌লো করুণ সুরে—
"ভুলো না গো ভুলো না এই পথ-বাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা?"
শপথ আমার, তোমরা বোলো তা'রে
তা'র কথাটি দাঁড়িয়েছিলো মনের পথের ধারে,—
বোলো তা'রে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে,—
লিখন খানি রাখিনু এইখানে।

১

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগালো আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভা-তলে
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিলো মাতি'
ছুটে এসেছিলো দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী,
সুরের বরণ-মাল্যে সবারে বরিয়া নিলো কবি।
কি সঙ্কোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হ'লো বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ॥

২

মোরে তুমি লজ্জা করো নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজে নিলে ডাকি'।
আপনারে আপনি জানালে;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি'।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চ'লেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কি জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ু ভরে পাঠালে আকন্দ॥

৩

হিয়া মোর উঠিল চমকি'
পথ মাঝে দাঁড়ানু থমকি',
তোমারে খুঁজিনু চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি'
আছিলে কাব্যের দুয়োরাণী
পথ-প্রান্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তা'রা সবে নাম-গোত্র-হীন
কাড়িতে জানে না তা'রা পথিকের আঁখি-উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ
চিনিলাম তোমারে আকন্দ॥

৪

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুম কাননে,
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ আলোকে
পড়োনি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জ্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি',
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্র-হাসি উদাসী আকন্দ॥

৫

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরাণ ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখো গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ॥

চাপাড্‌ মালাল্‌,
১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে
পʼড়ে আছে ঘাসে,
যে-ঘাস একদা তাʼরে দিয়েছিলো বল,
দিয়েছিলো বিশ্রাম কোমল॥

পʼড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, "একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পʼড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।"

আমি বলিলাম, "মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব্ব বিত্ত রিক্ত করিʼ যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহার-নিদ্রার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, ব'লেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধ'রেনি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে ;
যা পেয়েছি, যা ক'রেছি দান
মর্ত্ত্যে তা'র কোথা পরিমাণ ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চির-সুন্দরের সুর-পুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তা'র পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তা'রে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্ব্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি ॥

আমি যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ ॥

চাপাড্ মালাল্,
১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

চিঠি

শ্রীমান্ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজ্‌লো কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তা'র পুরোপুরি বাংলা দেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানী।
প্রকাশ্যে তা'র থাক না যতই শাদা মুখের ঢঙ্,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ্।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তা'র দাম?
চারু কণ্ঠে ঠাঁই নাহি তা'র, ধূলায় পরিণাম॥

যূথী বলে, "আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।"
আমি বলি চ'ম্‌কে উঠে, আরে রোসো, রোসো;
জিৎবে গন্ধ, হার্‌বে কি গান? নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানিনে কার জিৎ।
তিন্‌টে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি' গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁই বাগানের আরেক দিনের গান যা র'চেছিনু

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুন্‌ছি নাকি বাংলা দেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে ক'র্‌ছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি'।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলিব ভূদেব যারা
বাংলা দেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে ক'র্‌বে সারা।
সিম্‌লে নাকি দারুণ গরম শুন্‌ছি দার্জ্জিলিঙে,
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে॥

জানি তুমি ব'ল্‌বে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণু-বীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝম্‌ঝমানি।
শুনে আমি রাগ্‌বো মনে, কোরো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে ব'লেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তা'রা তো নয় ফাঁকি,
গিল্‌টি-করা তক্‌মা-ঝোলা নয় তাহাদের খাকী।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তা'দের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো তো সাজাবে জুঁই দেবার্চ্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তা'রাই চিরটা কাল? গ'ড়বে পাষাণ-কারা?

রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে তো এক-দমকের বায়ু,
সবুর ক'র্‌তে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই ব'লে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি',
ভগবানের ব্যথার পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাত-কড়ারই কড়াক্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্‌টোদিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তবু সহে না তবু,
ধর্ম্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তা'রে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্য্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগ্‌রে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্য্য-দেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হ'য়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুক্‌রে ওঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে॥

টুটলো কত বিজয়-তোরণ, লুটলো প্রাসাদ-চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হ'লো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর স'বে।
রঙীন কুর্ত্তি, সঙীন মূর্ত্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুক্‌রো হ'য়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেল্‌বে হোলির ফাগ।
পাগ্‌লা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক্‌ বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তা'রাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তা'রেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচ্‌তে তা'রাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন ক্ষেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তা'র ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জ্জি' বলে আমিই সত্য, দেব্‌তা মিথ্যা মায়া;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশীন্‌-গান্‌-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান—

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হ'তে তুই,
ও আমার জুঁই।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেনো কি ?"
তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহ-ব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হ'তে তুই,
ও আমার জুঁই।
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কি স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ ব'লেছে নিঃশ্বাসি',
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন-সুখের মতো কোথা হ'তে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কি বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে রাতে তোমার মালা ব'লেছে মর্ম্মের কাছে আসি',
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস ব'হেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
বক্ষে এনেছিস কার
যুগ-যুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ;
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া ?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চির-প্রত্যাশার কোন্ বাঁশী
"আমি ভালোবাসি।"

বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জান্‌লাখানি ধ'রে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন ক'রে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছো জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রু ঢেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি' সাজ্‌তে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপ-কথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জানো না তো আছো কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছো চোখের নীরব ভাষায়।
হয়-তো সে কোন সকাল-বেলা শিশির-ঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আস্‌বে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়।

বুয়েনোস্ এয়ারিস্ ,
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪ ।

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে,
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখীরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তা'র বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি' খুঁজি'॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারিনা বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—

মলিন আকাশ তলে
যেন কোন খেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে ॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্ত-নিশীথ সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানালো সে কথা যে
গোপন হৃদয় মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারিনি।
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লিরবে তাহার কিঙ্কিণী ॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সঙ্গোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি পরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ ক'রে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, "এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি,"
আমি বলি বুঝাতে পারিনে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ব-বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানিনে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কি কহ," সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে!

বুয়েনোস এয়ারিস্,
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

সৃষ্টিকর্ত্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁ'রে, শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিধারা
কি অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কি যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁ'র আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তা'র দু'টি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তা'র স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন্ বীণা বাজে
যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্ব্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে॥

বুয়েনোস এয়ারিস্,
২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহ মাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীণ্-কার।

সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হ'লো দিগন্তের ভুরু,
বৃষ্টির নাচনে মাতা,
বনে মর্ম্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।

ভরা হ'লো আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার,
হায় লাগিল না সুর
কোথায় সে বহুদূর
বীণা ফেলে এসেছি আমার॥

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাবো আশে
খুঁজে দেখি চারি পাশে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীণ্-কার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁওয়া লাগে একি ?
এ-পারের যত পাখী
সবাই কহিল ডাকি'
ও-পারের গান গাও দেখি।
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাবো ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্ত বাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নত মুখে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার ॥"

এলো বুঝি মিলনের বার
আকাশ ভরিল ওই ;
শুধাইলে, "সুর কই ?"

বীণা ফেলে এসেছি আমার
ওগো বীণ্-কার।
অস্ত-রবি গোধূলিতে
ব'লে গেলো পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
"তারে তারে লাগাও ঝঙ্কার।"
কানাড়াতে সাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার॥

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিবো তা'রে,—
চাহিলাম চারিধারে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীণ্-কার।

কাজ হ'য়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি'
দুলিয়া দুলিয়া ওঠে মাঠে।
যে শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে
সে আলোতে হ'তে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে ;
বীণা ফেলে এসেছি আমার॥

সান্ ইসিড্রো,
২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্দ্ধপানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তা'র সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্ম্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তা'র শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার॥

দয়া কোরো, দয়া কোরো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ-কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্ম্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব॥

অকস্মাৎ দস্যুতায় তা'রে রিক্ত করি' নিতে চাও
সর্ব্বস্ব তাহার তব সাথে ?
ছিন্ন করি' লবে যাহা চিহ্ন তা'র রবে না কোথাও,
হবে তা'রে মুহূর্ত্তে হারাতে।

যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি' সর্ব্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে॥

আস্থক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বর-তলে,
শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হ'য়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তা'রে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি॥

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি' তা'র সর্ব্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তা'র যে-অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তা'র খুলে।
তাহার গৌরবে লহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তা'রি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তা'রি ফলে তব সফলতা॥

সান্ ইসিড্রো,
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তা'রি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হ'তে লেখে মোর ধূলিপটে দীপ-রশ্মি-রেখা
অসম্পূর্ণ লেখা ॥

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত-না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্ম-বিধবা তা'রি এক প্রান্তে র'য়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ ॥

উৎসব সভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন ক'রে আনি।
সে লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধূলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির ॥

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে, "জানি,"
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্য-যান, হে তুমি রাজার জয়-রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
তীব্র-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই
কিছু নাই, নাই ॥

কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি; সুদিন দুর্দ্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বার বার কচি ঘাস কোথা হ'তে আসে মোর কোলে,
চ'লে যায়,—সে-ও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে,
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়,
কিছু নাহি রয় ॥

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরী,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্য-ক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্ত্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ব্ব-বন্ধ-হীন নিত্য চলি তা'রি মধ্যখানে,
ভবিষ্যের পানে॥

তাই আমি চির-রিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে,
পারিনে রাখিতে তাহা, সে গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধূলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল॥

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।
পান্থের পাথেয় হ'তে খ'সে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা,
ধূলিরে বঞ্চনা করি' কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর পরে নাই প্রীতিলেশ,
মোরে করে দ্বেষ॥

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চ'লে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভ'রে
শিশু বোঝে মোরে॥

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুসি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তাহা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙা-গড়া দুই নিয়ে নৃত্য তা'র অখণ্ড উল্লাসে,
মোরে ভালোবাসে॥

সান্ ইসিড্রো,
২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি'
সেখানে মিলেছিনু সময়-হারা
একদা তুমি আর আমি।
চ'লেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে ;—
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি'
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি॥

সেখানে ব'সেছিনু আপনা-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

কিসের খুসি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হ'লো তারাময়;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহা-বেগে
ছুটেছে দশদিক্‌-গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি॥

বিজনে ব'সেছিনু আকাশ চাহি'
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখি-পাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিন যামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি॥

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়-কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরাণ-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি ॥

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ,
৯ জানুয়ারী, ১৯২৫।

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোক-চ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খ-ধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিলো, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি';
সে তব সঙ্কেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্ম্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি॥

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবন-যাত্রা মম,
—সিন্ধু-গামী তরঙ্গিণী সম—
এত-কাল চ'লেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে

অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরু-চ্ছায়ে খেলা-ঘর ক'রেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে॥

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি' দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হ'লো।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি' তোমার প্রাঙ্গণ-তলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"॥

দিনের আড়ালে থেকে কি চেয়েছি পাইনি উদ্দেশ,
আজ সে সন্ধান হোক শেষ।
হে চির-নির্ম্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্ব্বারিত হোক
আঁধারের আলোক ভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেই-খানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হ'তে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার॥

দিনের সংগ্রহ হ'তে আজি কোন অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠির হাতে পেয়েছি কীর্ত্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই-সব রত্ন অলঙ্কার,
ফিরিয়াছি দেশ হ'তে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হ'লো সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হ'য়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে॥

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হ'য়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাবো পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রা সহচরী
অকারণে দিয়েছিলো মোর হাতে মাধবী-মঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো র'য়েছে তা'র গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেবো তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে॥

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হ'তে
পাড়ি দিলো এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হ'তে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রি-শেষে
অরুণ কিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে

হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধূলা এরে কিছুতে পারেনি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে॥

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এলো মিশে,
বুঝেও তখন বুঝিনি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিলো এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিলো তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হ'লো অবসান
আমার ধেয়ান হ'তে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে॥

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ,
১০ জানুয়ারি, ১৯২৫।

প্রাণ-গঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্প পত্র করি' অর্ঘ্য দান
পূজারীর পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি'
গানের অঞ্জলি দান করি'
প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে॥

বিগলিত প্রেমের আনন্দ বারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটা-জালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হ'লো তা'র।
কত না যুগের পাপ-ভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিলো অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তা'র বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গল সঙ্গীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চ'লেছে ইঙ্গিত

দৈব-স্পর্শে তা'র
আমারে সে ধূলি হ'তে করিল উদ্ধার;

অঙ্গে অঙ্গে দিলো তা'র তরঙ্গের দোল ;
কণ্ঠে দিলো আপন কল্লোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিলো ভরি'
বর্ণের লহরী।
খুলে গেলো অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিলো প্রিয়,
অনির্ব্বচনীয়॥

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণ-জাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্ত্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তা'র লাগি', কহ
কার সাথে আমার কলহ ?
এই নীলাম্বর-তলে তৃণ-রোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
'ধন্য হ'য়ে ভেসে যাক গান॥

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ,
১৬ জানুয়ারী, ১৯২৫।

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি',
আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
শুধালেম তা'রে "যদি এ বদল করি
হার হ'বে কার বল্।"
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী
"এসোনা বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফল ভার
অশ্রুর রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তা'র
নিদয়া সে মনোহরা॥

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল' হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হ'লো জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চ'লে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা॥

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ,
১৭ জানুয়ারী, ১৯২৫।

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এলো চরণে তোমার উপহার দিলো আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখীর মতন গান গেয়ে চ'লে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-পরে
ঘোম্‌টা আড়ালে কহিলে করুণ-স্বরে
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার কানন কুসুম-হীন॥"

কহিলাম "ওগো রাণী,
সাগর-পারের নিকুঞ্জ হ'তে এনেছি বাঁশরীখানি।
উতারো ঘোম্‌টা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লবো।"
কহিলে "আমার হয়নি রঙীন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম আসনে বসিব যখন ডেকে লবো মোর পাশে"॥

কহিলাম "ওগো রাণী,
সফল হ'য়েছে যাত্রা আমার শুনেছি আশার বাণী।
বসন্ত সমীরণে
তব আহ্বান-মন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপ-মুখর গন্ধ-মাতাল দিনে
ঐ জানালার পথখানি লবো চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়॥"

মিলান,
২৪ জানুয়ারী ১৯২৫।

সঞ্চিতা

অবসান

বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদ-মন্দ্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গ পানে
ছুটিয়া গেলো না ঊর্দ্ধে উদ্দাম পরাণে
বসন্তে মানস-যাত্রী বলাকার মতো ?
কেন তোর সর্ব্বতন্ত্র সবলে প্রহত
মিলিত ঝঙ্কার ভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্ত্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি' ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হ'লো ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন-তার,
সেদিনের মতো ক'রে বাজেনাকো আর ?

(প্র—ভাদ্র, ১৩০৩)

অন্তিম প্রেম

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী,
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বসি' উল্লসি'
আমারে কি পেতে চাস চির আলিঙ্গনে ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের উন্মত্ত মিলনে
তোর বক্ষমাঝে চাস করিতে বিলয়
আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখ ভয় ?
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি' তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জ্জনে,
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা
শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রখরা,
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,—
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্দ্ধ রজনীর
বাসর-ঘরের মতো নিস্সুপ্ত নির্জ্জন ;—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন ?

(প্র—১৩০৩)

পত্র

সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব,
ল'য়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে,
গ্রহ তারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে ;
হাঁকায়ে দু'চারি জোড়া
তাজা পক্ষীরাজ ঘোড়া,
কলপনা গগন-ভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশ কাল যায় লঙ্ঘি'
কোথা প'ড়ে থাকে এ মেদিনী ?
সেই তুমি ব্যোমচারী,
আকাশ-রবিরে ছাড়ি'
ধরার রবিরে করো মনে,
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্ত্তবাসী জনে।

ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ
দূরবীণ ভ্রষ্ট-লক্ষ্য
কোথা হ'তে কোথায় পতন।
ত্যজি' দীপ্ত ছায়া-পথে
পড়িয়াছ কায়া-পথে,
মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন।
বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক জন্ম জন্ম বেঁচে।—
তবু-তো ক্ষণেক তরে
ধূলিময় খেলা ঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
তুমি অদ্য কাশী-বাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি'
বাবা ভোলানাথের শরণ ;
দিব্য নেশা জ'মে ওঠে
দু'বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম,

পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা দেবী চেপেছেন বক্ষে,
সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম,
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান নাহি বাঁশী,
দিন রাত্রি শুধু কাশী,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
নব-রস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের
ব'হে গেল সর্দ্দির প্রবাহে।
অতএব নমো নম
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে,
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমাসনে।

উড্‌ফিল্ড, শিম্‌লা,
(* জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫)

বসন্তের দান

অচির বসন্ত হায় এলো, গেলো চ'লে,
এবার কিছু কি কবি ক'রেছো সঞ্চয় ?
ভ'রেছো কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল–পবন–ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ? তপ্ত রৌদ্র হ'তে
নিয়েছো কি গলাইয়া যৌবনের সুরা,
ঢেলেছো কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছো কি করি' তা'রে অনন্ত মধুরা!

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা নিশীথে
নব–মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখো নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

(প্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ ।

প্রশ্রয়

১

দিয়েছো প্রশ্রয় মোরে, করুণা-নিলয়,
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছো প্রশ্রয় !
ফিরেছি আপন-মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে , নানা ব্যর্থ কাজে , তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর, প্রভু,
আজ তাহা জানি ! যে অলস চিন্তালতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তা'রিশাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে ,
নিগূঢ় শিকড়ে তা'র বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি'। দিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড পুরস্কার , সুখ দুঃখ ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছো প্রশ্রয়।

(২৩ ফাল্গুন, ১৩০৭)

সাগর সঙ্গম

হে পথিক কোন্ খানে
চ'লেছো কাহার পানে ?

পোহালো রজনী উঠে দিনমণি
চ'লেছি সাগর স্নানে
ঊষার আভাসে তুষার বাতাসে
পাখীর উদার গানে
শয়ন তেয়াগি উঠিয়াছি জাগি,
চ'লেছি সাগর স্নানে।

২

শুধাই তোমার কাছে
সে সাগর কোথা আছে ?

যেথা এই নদী বহি' নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে।
যেথা হ'তে রবি উঠে নব ছবি
মিলায় যাহার পাছে;
তপ্ত প্রাণের তীর্থ স্নানের
সাগর সেথায় আছে।

৩

পথিক, তোমার দলে
যাত্রী ক'জন চলে ?

গাণ তাহা ভাই শেষ নাহি পাই
চ'লেছে জলে স্থলে।
তাহাদের বাতি জ্বলে সারারাতি
তিমির আকাশ তলে
তাহাদের গান সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে ।

৪

সে সাগর কহ তবে
আর কতদূরে হবে ?

আর কতদূরে আর কতদূরে
সেই তো শুধায় সবে।
ধ্বনি তা'র আসে দখিন বাতাসে
ঘন ভৈরব রবে ।
কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে
আর কত দূরে হবে।

৫

পথিক গগনে চাহ
বাড়িছে দিনের দাহ ।

বাড়ে যদি দুখ হবো না বিমুখ
নিবাবো না উৎসাহ ।
ওরে, ওরে ভীত, তৃষিত তাপিত
জয়-সঙ্গীত গাহ ।
মাথার উপরে খর রবি-করে
বাড়ুক দিনের দাহ ।

৬

কি করিবে চ'লে চ'লে
পথেই সন্ধ্যা হ'লে ?

প্রভাতের আশে স্নিগ্ধ বাতাসে
ঘুমাবো পথের কোলে ।
উদিবে অরুণ নবীন করুণ
বিহঙ্গ কলরোলে
সাগরের স্নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হ'লে ।

(প্র—বৈশাখ, ১৩০৮)

সাগর-মন্থন

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি'! দেব দৈত্য দলে
কী রত্ন সন্ধান লাগি' তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
ফেনিল কল্লোল-ভঙ্গে? ওগো দাও দাও
কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও
তোমার অন্তর-লক্ষ্মী যে শুভ প্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি' হাতে
বিস্মিত ভুবন মাঝে, ল'য়ে বর-মালা
ত্রিলোক-নাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা
সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

(প্র— শ্রাবণ, ১৩১০)

শিবাজী-উৎসব

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে-
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিলো নামি'—
"এক ধর্ম্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

২

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খ-নাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী-সন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

৩

তা'র পরে এক দিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি' দিল দিগ্ দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্র-শিখা।
মোগল-উষ্ণীষ-শীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়-প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্র-নির্ঘোষে
কি ছিল বারতা।

৪

তা'র পরে শূন্য হ'লো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লী-রাজ-শালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক-মালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'লো তা'র সীমা।

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য-বিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গ-পথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল' চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল', পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'লো মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্য-রবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।

৭

অয়ি ইতিবৃত্ত-কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তা'রে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।

৮

হে রাজ-তপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তা'র এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজ-বৈরাগী
গিরিদরীতলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে—
সেই-মতো বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা।

১০

সেই-মতো ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্ব-ভারতে—
কী অপূর্ব্ব হেরি।
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি?
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রা বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচী-দিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি,
উদিল আবার?

১১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল' সবে কোন্‌কালে হ'য়েছে নিঃশেষ
কর্ম্ম - পরপারে,
এলো সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে।

১২

আজো তা'র সেই মন্ত্র, সেই তা'র উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ।

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এলো নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী,
বাঙালীর প্রাণ।

১৪

এ কথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দ-কাল ধরি'—
জানেনি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যা-তেজ দীর্ঘকাল করি' অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত।

১৫

মারাঠার প্রান্ত হ'তে এক দিন তুমি ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণ-দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগ-দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

১৬

মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মূরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজ-কিরীট শোভে লুকাবে না তা'র দিব্য-জ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।

১৭

সে-দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লবো।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল।
"এক-ধর্ম্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজি।"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

(শিবাজী-উৎসব, ১৩১১)

দুর্দ্দিন

ঐ আকাশ-পরে আঁধার মেলে কি খেলা আজ খেল্‌তে এলে
তোমার মনে কি আছে তা জান্‌বো না।
আমি তবুও হার মান্‌বো না, হার মান্‌বো না।
তোমার সিংহ-ভীষণ রবে,
তোমার সংহার-উৎসবে,
তোমার দুর্য্যোগ-দুর্দ্দিনে—
তোমার তড়িৎশিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লবো চিনে;—
কোনো শঙ্কা মনে আন্‌বো না গো আন্‌বো না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিম্বা পড়ি মাটির পরে
তবুও হার মান্‌বো না হার মান্‌বো না।

কভু যদি আমার চিত্তমাঝে ছিন্ন-তারে বেসুর বাজে
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা—
ওগো না পাই যদি নাইবা পেলেম সান্ত্বনা।
যদি তোমার তরে আজি
ফুলে সাজিয়ে থাকি সাজি,
প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকি ঘরে,
তবে ছিঁড়ে গেলে পুষ্প, প্রদীপ নিবে গেলে ঝড়ে
তবু ছিন্ন ফুলে কর্‌বো তোমার বন্দনা।
তবু নেবা-দীপের অন্ধকারে ক'র্‌বো আঘাত তোমার দ্বারে,
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা।

আমি ভেবেছিলেম তোমায় ল'য়ে যাবে আমার জীবন ব'য়ে
দুঃখ তাপের পরশটুকু জান্‌বো না—
তাই সুখের কোণে ছিলেম প'ড়ে আন্‌মনা।
আজ হঠাৎ ভীষণ বেশে
তুমি দাঁড়াও যদি এসে,
তোমার মত্ত চরণ ভরে
আমার যত্নে-গড়া শয়নখানি ধূলায় ভেঙে পড়ে
আমি তাই ব'লে তো কপালে কর হান্‌বো না।
তুমি যেমন ক'রে চেনাতে চাও তেম্‌নি ক'রে চিনিয়ে যাও
যে-দুঃখ দাও দুঃখ তা'রে জান্‌বো না।

তবে এসো হে মোর সুদুঃসহ ছিন্ন ক'রে জীবন লহ
বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা,
আমায় দুঃখ হ'তে ক'রো না আর বঞ্চনা।
আমার বুকের পাঁজর টুটে
উঠুক পূজার পদ্ম ফুটে;
যেন প্রলয়-বায়ু-বেগে
আমার মর্ম্মকোষের গন্ধ ছুটে বিশ্ব উঠে জেগে।
ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা।
আজ আঁধারে ঐ শূন্য ব্যেপে কণ্ঠ আমার ফিরুক কেঁপে,
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা।

(প্র—শ্রাবণ, ১৩১৪)

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রি দিন
তপোমগ্ন; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছো দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি'

জয় শঙ্খ তাঁ'র ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো ? জয়, তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল ?
মোছ্‌রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল।

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন শৃঙ্খল তা'র
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ? শাস্তি তা'রি তরে
যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,

কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহঙ্কার ;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায় ;
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তা'রে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণা-পাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ

কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি',—বজ্র গর্জ্জরব
ভেরি মন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
তা'র পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন্ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরমলাভে "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তা'র;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

(৭ ভাদ্র ১৩১৪)

সুপ্রভাত

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি',
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রা-জড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে, ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে গরজি' বাজে রে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন-মাঝে রে।
চমকি' জাগিয়া পূর্ব্ব ভুবন
রক্ত বদন লাজে রে।

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছো,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
রুদ্র-বীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেলো ফাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে;
ঝর ঝর করি' রক্ত-আলোক
গগনে-গগনে ঝরিছে;
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
কেহ বা স্বপনে ডরিছে।

তোমার শ্মশান-কিঙ্কর-দল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারী,
শুষ্ক অধর লেহিয়া-লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি'-ফুকারি'।

অতিথি তা'রা যে আমাদের ঘরে,
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-পরে,
খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে,—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে।
ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি'
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তা'র ক্ষয় নাই।"
হে রুদ্র, তব সঙ্গীত আমি
কেমনে গাহিব কহি' দাও স্বামী,
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়-ডমরু বাজাবো।
ভীষণ দুঃখে ডালি ভ'রে ল'য়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাবো।

এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিব-শঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে।
যে জাগিল তা'র চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে।

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি' জয়।
ভালোই হ'য়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা প'ড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হ'য়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে,—
মিলন-যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।
তিমির রাতি পোহায়ে
মহাসম্পদ্ তোমারে লভিব
সব সম্পদ্ খোয়ায়ে,
মৃত্যুরে লবো অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

(প্র—১৩১৬)